ইকুইটিবিডি অবস্থানপত্র, ১৭ জুন,২০১৯ (খসরা)

করের আওতা বাড়ালেই কর আদায় নিশ্চিত হবেনা, জনগনের মধ্যে কর প্রদানে রাজনৈতিক সদিচ্ছা জাগ্রত করতে হবে

১. জনগন কর কেন দিবে?

সরকার আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য ৫,২৩,১৯০ কোটি টাকার বাজেট ঘোষনা করছে, যা চলতি ২০১৮-১৯ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৮% বেশি। এ ছাড়া আগামী অর্থবছরে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩,৮১,৯৭৮ কোটি টাকা যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৯% বেশি এবং মোট বাজটের ৭৩%। মোট ঘাটতি বাজেট ১,৪৫,৩৮০ কোটি টাকা যা মোট জিডিপির ৫%। এই ঘাটতি মোকাবেলা করার জন্য সরকারকে বৈদেশিক ঋণ, আভ্যন্তরিন ও ব্যাংক ঋণ এবং সঞ্চয়পত্র ও বন্ড বিক্রির উপর নির্ভর করতে হয়। এতে করে মাথাপিছু ঋণ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৬৭,২৩৩ টাকা এবং সরকারকে নতুন বছরে ৫৭,০৭০ কোটি টাকা সুদ পরিশোধ করতে হবে যা মোট বাজেটের প্রায় ১১%। প্রতিবছর সরকার রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে থাকে তা কখনও অর্জন কতে পারেনা।

রাজস্ব আদায়ের কৌশল হিসেবে নতুন বাজেটে করের আওতা বিশেষ করে ভ্যাট এর হার ও এর আওতা বাড়ানো হবে এবং উপজেলা পর্যায়ে লোক নিয়োগ করা হবে। ভ্যাট আদায়ের এই পদক্ষেপের ফলে জনগণের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত/নিম্ন মধ্যবিত্ত/গরীরের কাঁধে যেমন করের বোঝা বাড়ছে এবং জীবনযাত্রা ব্যয় আরও বেশী বাড়বে। **কারন নতুন বছরে মোট রাজস্বের প্রায় ৭৩% ভ্যাট এবং আয়কর হতে আদায়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমরা মনে করি এই রাজস্ব আদায় কারা সম্ভব এবং জনগন স্ব-প্রণোদিত হয়ে কর প্রদান করবে যদি সে দেখে যে, তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার কর্তৃক প্রদেয় সেবা বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পানি, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি সেবাগুলো কোন প্রকার হয়রানির শিকার না সে তা যথাযথ ভাবে পাচ্ছে।**

প্রশ্ন হচ্ছে করের আওতা বাড়ালে কি কর আদায় সম্ভব? সুতরাং কর আদায়ে সরকারকে কৌশলী হতে হবে অর্থাৎ করের আওতা বাড়ালেই কর আদায় নিশ্চিত হবেনা, জনগনের মধ্যে কর প্রদানে রাজনৈতিক সদিচ্ছা জাগ্রত করতে হবে এবং কর ন্যায্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ সরকারকে কর আদায়ের ক্ষেত্রে সম্পদ সংগ্রহ ও তা পুনঃবন্টকারীর ভূমিকা নিতে হবে। বিশেষ করে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সেবায় বরাদ্দ বাড়িয়ে এদের জীবন যাত্রা মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। শুধু বরাদ্দ বাড়িয়ে কি জীবন যাত্রা মানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়; প্রয়োজন প্রতিষ্ঠান গুলোকে দূর্নীতিমুক্ত করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। জনগন যখন দেখবে তার প্রদানকৃত কষ্টার্জিত অর্থের কর সরকার যথাযথ ভাবে খরচ করছে, দূর্নীতি হচ্ছেনা, অর্থপাচার হচ্ছেনা, আইনের শাসন হচ্ছে অর্থাৎ কোথাও অভিযোগ করলে তার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, তখন জনগনর মাঝে কর প্রদানের আস্থা ও আগ্রহ জাগ্রত হবে।

২. কর দিল জনগনকে তার প্রাপ্য সেবা দিতে হবে

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্ধ দক্ষিন এশিয়ার দেশ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম। সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার টার্গেট এবং Education 2030 Framework for Action of UNESCO এর আদর্শমান অনুযায়ী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্ধ ও ব্যায় অনেক কম। **শিক্ষা ক্ষেত্রে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় ৩% খরচ করার কথা থাকলেও তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ২% এ নীচে খরচ হয় এবং UNESCO এর আদর্শমান অনুযায়ী জিডিপি'র গড়ে ৫% বাজেট থাকার কথা বলা হলেও শিক্ষা খাতে বাজেট থাকছে ২.৭৫%। ঠিক একইভাবে স্বাস্থ্য খাতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় ১.০৫% বাজেট থাকার কথা থাকলেও বরাদ্ধ দেয় হয় ১% এর নীচে। এতে করে এসডিজি বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে যাবে।** সরকারের উচিত অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ অন্যান্য বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া কেননা দেশের প্রান্তিক লেভেলে এই সেবা বিদ্যমান এবং এই সেবা যথাযথ ভাবে প্রদানের মাধ্যমে জনগনের আস্থা অর্জন করা যেমনি সম্ভব তেমনি আভ্যন্তরিন সম্পদ সংগ্রহ সহজতর হবে।

৩. ব্যাংকিং সেবা ফি আর্থিক শৃঙ্খলার আরো একটি মৌলিক শর্ত

সরকার ব্যাংক ঋণ সিঙ্গেল ডিজিটে আনার উদ্যোগ নিয়েছে যা আমরা সাধুবাদ জানাই কিন্তু ব্যাংক গুলো এটিএম সার্ভিস প্রদানের নামে, ব্যালান্স সার্টিফিকেট নামে, ক্যাশ ডিপোজিট/উত্তোলনের নামে, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড প্রদান ও তার পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের চার্জ, বিভিন্ন প্রসেসিং ফি, যাচাই ফি, ঋণ সমন্বয় ফি, অগ্রীম ঋণ আদায় ফি সহ দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান চার্জ গ্রাহকদের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে। শুধু তাইনয়, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের বিধি অনুযায়ী কাগজে কলমে একরকম সুদ হার নির্ধারন করে প্রকৃত আদায়ের সময় বেশি হারে সুদ আদায়ের ঘটনা

ঘটছে। এতে করে ব্যাংক গুলো এপদ্ধতিতে বিভিন্ন পন্থায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। **বিকাশ, রকেট সহ অন্যান্য এ জাতীয় সার্ভিসগুলোও কম সুবিধা নিচ্ছে না, যেমন ব্যাংকের মাধ্যমে ১ লক্ষ টাকা পাঠাতে খরচ হয় গড়ে ৭০টাকা কিন্তু বিকাশ, রকেট সহ অন্যান্য এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে খরচ হয় ১,৭৫০ টাকা হতে ১,৮৫০ টাকা।** তাই সরকারের উচিত এ সকল আর্থিক খাতের আয়ের উৎস সমূহ যাচাই করে তার খাত নির্ধারিত সহ এবং এর হার বা চার্জ নির্ধারন করে দেয়া।

৪. **অর্থ পাচার রোধে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে**

বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টর তথা আর্থিক খাত দেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ যোগান দেওয়ার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অভিজাত লুটেরাদের দ্বারা জনগণের সঞ্চিত সম্পদ লুটপাট ও রাষ্ট্রীয় অর্থ বিদেশে পাচার করার যন্ত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। শুধু সরকারি ব্যাংক (সোনালী, জনতা, রূপালী, অগ্রনী ও বেসিক ব্যাংক) হতে আনুমানিক ২০ হাজার কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ রয়েছে। **Global Financial Integrity (GFI)এর মে-২০১৭ এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৪ থেকে ২০১৫- এই ১১বছরে আমদানি-রপ্তানির সময়ে পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন, বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়েছে ৬,৮৬,৭০০ কোটি টাকা- অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৬২,৪২৭ কোটি টাকা।** এতে করে সরকার যেমন বিপুল অংকের রাজস্ব হারাচ্ছে তেমনি সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এধরনের ঘটনা জনগনকে কর প্রদানে ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করে, কারন সে বুঝে তার প্রদেয় কর বিভিন্ন দূর্নীতির মাধ্যমে আত্মস্যাৎ ও বাহিরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। তাই যারা নিয়মিত কর দেয় তাদেরকে বার বার হয়রানি না করে যারা প্রকৃত কর গোপন করে এবং অর্থপাচার করে তাদের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি দেখানো উচিত।

৫. **ক্রমবর্ধমান ঋণ খেলাপী ব্যাংকিং সেক্টরে অস্থিরতা ও বিনিয়োগ সংকট তৈরি করে**

আর্থিক খাতকে সংস্কার সহ জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। সরকার ঋন খেলাপীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেয়ার পরও দেশের **ব্যাংকিং খাতে খেলাপী ঋন ফি-বছর বেড়েই চলেছে যা গত মার্চ'১৯ শেষে দাড়িয়েছে ১,১০,৮৭৩ কোটি টাকা।** এই খেলাপীর অংক ২০১১ সালে ছিল ২২,৬৪৪ কোটি টাকা, ২০১২ সালে ছিল ৪২,৭২৫ কোটি টাকা, ২০১৩ সালে ছিল ৪০,৫৩৮ কোটি টাকা, ২০১৫ সালে ছিল ৫০,১৫৫ কোটি টাকা, ২০১৬ সালে ছিল ৬২,১৭২ কোটি টাকা, ২০১৭ সালে ছিল ৭৩,৩০৩ কোটি টাকা এবং ২০১৮ সালে ৯৩,৯১১ কোটি টাকা। **২০১১ সালের তুলনায় ২০১৯ সালের মার্চ শেষে মোট ৮৮,২২৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে যা শতকরা হিসেবে ৩৯০%।** এঋন গুলো পেছনে বেশির ভাগই রাঘোব-বোয়ালদের হাত থাকায় এর আদায় যথাযথ ভাবে হচ্ছেনা অথচ কৃষকরা ঋণ নিলে তা আদায়ে কোন প্রকার ছাড় দেয়া হচ্ছেনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষকদের জেলেও যেতে হচ্ছে। **সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বড় ঋন খেলাপীদের সুবিধা দেয়ার জন্য ২% ডাউন পেমেন্টে ৯% সুদে ১০ বছরে খেলাপি ঋণ পরিশোধের সুযোগ দিলে আদালত তাতে স্থগিতাদেশ দেয়। এধরনের সুবিধা দেয়া কোন ভাবে কাম্য নয় কারন এর ফলে ব্যাংকিং সেক্টরে যেমন অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি কাঙ্খিত বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না।**

৬. **তৃনমূলে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা আছে কি ?**

সরকারের বিভিন্ন সেক্টর ও প্রতিষ্ঠান গুলোতে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, সিটিজেন চার্টার, আচরন বিধিমালা, তথ্য প্রকাশ নীতিমালা সহ বিভিন্ন তালিকা নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে একজন নাগরিক তার সেবা পাবার জন্য কোন প্রকার হয়রানি, ঘুষ প্রদান বা অন্য কোন বাধার সম্মুখীন হলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে এবং কিধরনের কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা ভুক্তভোগী যেন জানতে পারে। এতে করে জবাবদিহীতা যেমন নিশ্চিত হবে তেমনি কর প্রদানে জনগনের স্বদিচ্ছা জাগ্রত হবে।

৭. **নতুন বাজেটে কালো টাকা সাদা করার বর্তমান যুক্তি কতটা সঠিক ?**

প্রস্তাবিত বাজেটে কালো টাকা সাদা করার যে সুযোগ দেয়া হয়েছে, যা আমরা মনে করি বৈষম্যমূলক ও দুর্নীতিবান্ধব এবং এটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি পরিপন্থী। **এবারই ফ্ল্যাটের পাশাপাশি জমি কেনাতেও কালো টাকা বিনিয়োগ করার সুবিধা দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্কে শিল্প স্থাপনে ১০% কর দিয়ে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগ করা সহ এ সিদ্ধান্তকে ৫ বছরের জন্য বৈধতার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কেবল ১০% হারে কর দিয়ে কালো টাকার বৈধতা দেয়ার ফলে নিয়মিত করদাতা এবং সম্ভাব্য সৎ করদাতাগন কর প্রদানে নিরুৎসাহিত হবে সর্বপরি সৎপথে এসব খাতে আয় ও সম্পদ আহরণর কঠিন হবে, কারন নিয়মিত করদাতাদেরও কোন কোন ক্ষেত্রে ৩০% পর্যন্ত কর দিতে হয়, ফলে এরা বৈষম্যেরও শিকার হবে।** অতীতেও কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল কিন্তু দেখা গেছে খুব কম পরিমান টাকাই সাদা হয়। স্বধীনতার পর সব সরকার এ পর্যন্ত মোট ১৬ বার কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়েছিল এবং এ পর্যন্ত মোট ১৪,০০০ কোটি টাকা সাদা হয়েছে যা নতুন বাজেটে মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষমাত্রার

৪%। আমরা মনে করি জোড় জবরদস্থি করে কর বা রাজস্ব আদায় তেমন সুফল বয়ে আনবেনা এবং এতে করে কর প্রদানকারী এবং আদায়কারী উভয়ই দূনীতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জনগনের মধ্যে কর প্রদানে রাজনৈতিক সদিচ্ছা জাগ্রত করতে দূর্নীতিকে জিরো টলারেন্স দেখানে হবে এবং সৎকরদাতাদের উৎসাহিত করতে হবে।

৮. **কর আদায়ে জনগনের কাছে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করতে হবে।**
শুধুমাত্র উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্ধ ও তা ব্যায় করার জন্য বরাদ্ধ দিলে চলবে না, সংসদ সদস্যদের তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকা হতে আভ্যন্তরিন সম্পদ আহরনের টার্গেট ও তা আদায়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগনকে কর প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে। **সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের জানাতে হবে তার এলাকার উন্নযনের জন্য সরকার কত টাকার বাজেট বরাদ্ধ করেছে এবং এর বিপরিতে কত টাকার আভ্যন্তরিন সম্পদ আহরন হয়েছে অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের তাদের এলাকার জনগনের কাছে দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহীতা থাকতে হবে।**

৯. **আমাদের প্রস্তাবনা**

১. করের আওতা বাড়ালেই কর আদায় নিশ্চিত হবেনা, জনগনের মধ্যে কর প্রদানে রাজনৈতিক সদিচ্ছা জাগ্রত করতে হবে। জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সেবায় বরাদ্দ বাড়িয়ে এবং সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

২. সরকারের বিভিন্ন সেক্টর ও প্রতিষ্ঠান গুলোতে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, সিটিজেন চার্টার, আচরন বিধিমালা, তথ্য প্রকাশ নীতিমালা সহ বিভিন্ন তালিকা নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে একজন নাগরিক তার সেবা পাবার জন্য কোন প্রকার হয়রানি, ঘুষ প্রদান বা অন্য কোন বাধার সম্মুখীন হলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে।

৩. সরকার প্রকার দুর্নীতি ও অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে করে অন্যায় পথে ব্যাংক লুট, অর্থপাচার, ঘুষ, চোরাচালান সহ সকল প্রকার অনৈতিক কাজ করার সাহস কেউ না পায়।

৪. ব্যাংক ও আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রনেকেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে।

৫. ব্যাংক গুলো বিভিন্ন সার্ভিস প্রদানের নামে ও তার পরিচালনা জন্য বিভিন্ন ধরনের চার্জ, বিভিন্ন প্রসেসিং ফি, যাচাই ফি, ঋণ সমন্বয় ফি, অগ্রীম ঋণ আদায় ফি সহ দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান চার্জ গ্রাহকদের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে। তাই সরকারের উচিত এ সকল আর্থিক খাতের আয়ের উৎস সমূহ যাচাই করে তার খাত নির্ধারিত সহ এবং এর হার বা চার্জ নির্ধারন করে দেয়া।

৬. সংসদ সদস্যদের বাজেট বরাদ্ধ দেয়ার পাশাপাশি তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকা হতে আভ্যন্তরিন সম্পদ আহরনের টার্গেট ও তা আদায়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭. অর্থ পাচার রোধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্যের বাজার মূল্য যাচাইয়ের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সেল থাকতে হবে।

৮. প্রাতিষ্ঠানিক সকল স্তরকে দূর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে

৯. বিদেশীদের চাপে ভ্যাট না বাড়িয়ে এবং ভর্তুকি না কমিয়ে সরকারী বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে ঘাটতি সমন্বয় করতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করার জন্য "Public Expebditure Review Commission" করতে হবে এবং সে অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাতে হবে।

১০. পরোক্ষ কর বিশেষ করে ভ্যাট না বাড়িয়ে প্রত্যক্ষ কর বাড়াতে হবে। ধনী এবং বহুজাতিক কোম্পানী সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যাতে প্রকৃত কর গোপন ও অর্থ পাচার করতে না পারে তা জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করা। এতে করে সরকার বিপুল অংকের রাজস্ব আদায় করতে পারবে।

সচিবালয় ঃ ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড়: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৮৮-০২-৫৮১৫০০৮২/ ৯১২০৩৫৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮১৫২৫৫৫, ই মেইল: info@equitybd.net, ওয়েব: www.equitybd.net

যোগাযোগ: মোঃ আহসানুল করিম,
মোবাইল: +৮৮০১৭১৩৩২৮৮০০